Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.33-39
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শক্তি সাধনা ও শাক্ত গান: আঠারো শতকের সমাজ ইতিহাসের দায়বদ্ধতা

অরিন্দম অধিকারী

সহকারী অধ্যাপক, মানকর কলেজ, মানকর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The unstable political situation of the eighteenth century questioned the existence of human life. In the rules and oppression of East India Company, people started worshiping Shakti. The early Middle Ages of Bengali literature the power of God was vindictive. They collect their worship in forcefully from the people. In eighteenth century, times have changed. Over the time, people's ideas about God have changed. Bharatchandra has brought the new form of God in front of people in his poetry 'Annada Mangal'. In that environment, some people adopted the goddess as form of mother or daughter or friend. Shakta Poet Ramprashad Sen adopted God Kali as her mother, in some time daughter or Supreme power of Universe. When people feel tired of his life, they want to take shelter of peace in the God Shakti as a child in his mother. Different land policies of foreign rulers in this century creat a class of new zamindars. They have no relation with the land. These zamindars and their related Naib-Gomstas started worshiping the Kali form of Adisakti and worshiping Shakti in their own domain. Thus the society of this century adopted Shakt Sadhana in a new form outside of Mangalkavya.

Key Word: Tantra Sadhana, Adi Shakti, Buddhist Tantra, East India Company, Foreign Trade, Bamachar, Kaulinya System.

ভারতের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের দিকে তাকালে দেখা যায় পূর্ব-ভারত তথা বাংলাদেশ বহু প্রাচীন কাল থেকেই শক্তি সাধনার ক্ষেত্র বলে পরিচিত। আনুমানিক সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে বাংলায় তন্ত্র সাধনা ও বহু তান্ত্রিক দেবীর উদ্ভব শুরু হয়। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এই সাধনা বিস্তার লাভ করে। শক্তি সাধনায় ভাটা পড়ে মুসলমান আক্রমণের পর। সতেরো শতকের শেষ থেকে, বিশেষ করে আঠারো শতকে এসে শক্তিকে আশ্রয় করে তন্ত্র সাধনা পুনরায় শুরু হয়। লেখা হয় শাক্ত সংগীত। বাংলাদেশ স্বভাবতই শক্তি পুজোর দেশ বলে পরিচিত। এই জায়গায় এসে প্রশ্ন জাগে, শক্তির পীঠস্থান বাংলায় শাক্ত সাধনাকে কেন্দ্র করে গান বা সাহিত্য রচিত হতে এত দেরি হবার পিছনে কী কারণ ছিল? অথবা এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এমন কী ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবর্তন এল, যার কারণে এতগুলো বছর পর নতুন রূপে শাক্ত সাধনা ফিরে এল? লেখা হল শাক্ত সাহিত্য! এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে দেখতে হবে তন্ত্র সাধনা ও কালীকে কেন্দ্র করে শক্তি সাধনার ইতিহাসকে।

ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র ও দর্শনে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছে। সেখানে পরমব্রহ্ম হলেন শক্তির আধার অর্থাৎ শক্তিমান। ভারতীয় দর্শনে এই শক্তি প্রকৃতি বা দেবী রূপে পূজিত। আর শক্তিমান হল পুরুষ। এই দুইয়ের ভেদ ও অভেদ দুইই স্বীকার করেছে ভারতীয় দর্শন। তন্ত্র সাধনার আধার হল এই মাতৃদেবী শক্তি। এই শক্তি ও তন্ত্র সাধনার উদ্ভবের ইতিহাস নিয়ে বহু মত ও বিতর্ক রয়েছে। একটা সময় পর্যন্ত বিশ্বাস করা হত তন্ত্র ও শক্তির সাধনা অনার্য সময় থেকে চলে আসছে। আর্যরা ভারতে প্রবেশের পর এই তন্ত্র সাধনার দেবীকে বেদ ও পুরাণে স্থান দেওয়া হয়। আর্য সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক। তাই বৈদিক শাস্ত্রেও পুরুষ দেবতার প্রাধান্য। অন্যদিকে অনার্য সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। তাই দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, ভোট-চীনীয় প্রভৃতি অনার্য জাতির মধ্যে মাতৃদেবীর প্রাধান্য লক্ষণীয়।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজে দেবতার তুলনায় দেবীর সংখ্যা বেশি। অনার্য সমাজে লোকদেবতার উদ্ভবের ইতিহাসে দেখেছি মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি ভয় ও তাকে সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যেই সমাজ বিবর্তনের ধারায় দেবতার জন্ম। একই উদ্দেশ্যে তন্ত্রেরও উদ্ভব হয়েছে। সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 'তন্ত্রের কথা' বইয়ে বলেছেন, 'অনেকের মতে আদিম মানুষের নানাপ্রকার ভয়ের মধ্যে রয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রের জন্মবীজ। সর্পভয়, হিংস্র জন্তুর ভয়, রুদ্র প্রকৃতির ভয়, রোগভয় প্রভৃতি জানা ও অজানা শত্রুর আক্রমণের প্রতিষেধকরূপেই তন্ত্রের প্রাথমিক মন্ত্রগুলির জন্ম হয়। সঙ্গে জুটেছিল অতীন্দ্রিয় শক্তিলাভের চেষ্টা- এ-সব বিপদেরই প্রতিরোধকল্পে। তার ফলে এল জাদুবিদ্যা।'[১] পূর্ব-ভারত তথা বাংলাদেশ প্রাচীনকাল থেকেই অনেকখানি আর্য প্রভাবমুক্ত। পূর্ব-ভারতে আদিম অধিবাসীদের সংখ্যাধিক্য ছিল প্রথম থেকেই। আর্যরা বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ রূপে করায়ত্ত করতে পারেনি কখনই। গুপ্ত যুগে বাংলাদেশের বৈদিক ও পৌরাণিক সংস্কৃতির আর্যীকরণ শুরু হয়। তাই অনার্য সংস্কৃতি আজও এখানে টিকে আছে। এই কারণে ভারতে তান্ত্রিক সাধনার পীঠস্থানও বাংলাদেশ। অনেক গবেষক এই মতকে মান্যতা দেননি। তারা বেদ, পুরাণ, সাহিত্য অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন শক্তির অস্তিত্ব আর্য সময়কালেই।

তন্ত্র সাধনার আশ্রয় যে শক্তি দেবতা, তার অনেকগুলি রূপের উল্লেখ ঋগ্‌বেদসহ অন্যান্য বেদ ও পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। শশীভূষণ দাশগুপ্ত তন্ত্রের অনার্য উদ্ভবের তত্ত্বকে খারিজ করে বলেছেন, 'প্রাচীনতম বৈদিক সূক্তে মাতৃদেবীর স্পষ্ট উল্লেখ না পাইলেও যজুর্বেদ, অথর্ববেদ এবং কিছু কিছু ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদাদিতে বিভিন্নভাবে দেবীর উল্লেখ পাইতেছি। তাহা ছাড়াও একটি সংস্কার সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। যাহা কিছু অবৈদিক তাহাই অনার্য এমন কথা মনে করিবারও কোনও কারণ নাই। আর্যগণ সকলেই বৈদিক আর্য ছিলেন একথা নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ করিবার মত তথ্য আছে কি? ইহা ব্যতীত পূর্বালোচিত মতটি সম্বন্ধে আমাদের প্রধান আপত্তি হইল এই যে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হইতেই যদি ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপূজার প্রচলন হইত তাহা হইলে পৃথিবীর আরও বহু স্থানে এই-জাতীয় মাতৃপূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া উচিত ছিল; কারণ এই-জাতীয় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পৃথিবীর বহু স্থানে বহু প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে।'[২]

ভারতের দক্ষিণাপথের কয়েকটি স্থানে শক্তি সাধনার প্রচলন হলেও সমগ্র অনার্য ভূমিতে তন্ত্র সাধনা বিস্তার লাভ করেনি। এছাড়াও তন্ত্রের মন্ত্রগুলি যে 'ওঁ' শব্দ দিয়ে শুরু, তা প্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র। তন্ত্র সাধকরাও মনে করেন তন্ত্রের উদ্ভব বেদ ও বৈদিক শাস্ত্র থেকে। তন্ত্র সাধনার উদ্ভবের এই দুটি মতকে সামনে রেখে মনে হয়েছে, তন্ত্রের ধারাটির উদ্ভব যে সময়েই হোক না কেন, তার মধ্যে অনার্য প্রভাব সুস্পষ্ট। 'ওঁ' মন্ত্র

বৈদিক হলেও তন্ত্রের 'হ্রীং' 'ক্লীং' প্রভৃতি শব্দের উৎস এখন নির্ণীত হয়নি। এমনকি তন্ত্রের গোপন সাধনপ্রণালীগুলি পর্যন্ত আদিম সমাজের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, জাদুবিদ্যা ইত্যাদির মতোই ছিল। অনার্য পরবর্তী সময়ে বৈদিক ও হিন্দু শাস্ত্রে এই সাধনাকে আংশিক আত্তীকরণের মধ্যে দিয়ে হিন্দু তন্ত্রসাধনা রূপে গড়ে তোলা হয়েছে। তন্ত্র মূলত দুই রূপে ভারতে বিস্তার লাভ করেছে। বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্র। এদের সময়কাল নিয়েও বিতর্ক আছে। কেউ বলেছেন বৌদ্ধতন্ত্র অগ্রজ। কারও মতে হিন্দুতন্ত্র অগ্রজ।

বাংলার তন্ত্র সাধনার আশ্রয় শক্তি দেবীর প্রথম রূপের আভাস পাওয়া যায় ঋগ্‌বেদের ১২৫শ সূক্তের দেবী বন্দনার মধ্যে। এর মধ্যেই শক্তিদেবীর বীজ নিহিত ছিল। এছাড়াও ঋগ্‌বেদের রাত্রিসূক্তে রাত্রি দেবীর বন্দনাকেও পরবর্তীকালে মাতৃদেবীর সাধনার উৎস বলে ধরা হয়। রাত্রি দেবীর কৃষ্ণ বর্ণ ও তার সর্বকালব্যাপী রূপ তন্ত্রের দেবীর আদিরূপকে তৈরি করেছে। সাধকরা মনে করেন বেদ থেকেই তন্ত্রের উদ্ভব। বেদের মধ্যেই সন্ধান করেছেন তন্ত্রের উৎস। কেউ কেউ মনে করেন বেদের যজ্ঞাগ্নি থেকেই শক্তিদেবীর উদ্ভব। অথর্ব বেদেও শক্তির এমনই রূপের আভাস পাওয়া গেছে। অনেকে মনে করেন অথর্ব বেদই শক্তি সাধনার উৎস। অথর্ব বেদে শক্তি সাধনার তত্ত্ব, শাক্ত উপাসনা, তন্ত্রাচার, তান্ত্রিক রীতিতে দীক্ষাদানের প্রণালী, বিভিন্ন জাদুশক্তি উদ্ভাবনের প্রণালী ও মন্ত্রের উল্লেখ আছে।[৩] সেই কারণে অথর্ব বেদকে শক্তি সাধনার আদি উৎস-গ্রন্থ বলে ধরা হয়।

তবে শাক্ত সাধনার দেবী উমার প্রথম স্পষ্ট রূপে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় উপনিষদে। 'কেন' উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমার সাক্ষাৎ লাভ করেন ইন্দ্র। কঠোপনিষদে জীবনের ধন, মান, অর্থ, জয় ইত্যাদি মানুষের কামনার মধ্যে লুকিয়ে ছিল তন্ত্র উদ্ভবের বীজ। সাধকরা সংসারের বন্ধনের মধ্যে থেকে ওই কামনাগুলিকে নিবৃত্তির মধ্যে দিয়ে পরমকে পেতে চায় সাধকরা। সেই কারণে শাক্তপদের একটি দিকে উমা-মেনকা-গিরিরাজের সাংসারিক জীবনের ছবি উঠে এসেছে। রামপ্রসাদের গানে উঠে এসেছে তার জীবনে সাংসারিক বন্ধনের কথা। আদিশক্তি উমা বা কালিকার রূপ উপনিষদ, পুরাণে বহু বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকের রূপ ধারণ করেছে।

তন্ত্র সাধনায় শিব ও শক্তির প্রভাব সর্বব্যাপী। তন্ত্রে এই দুইয়ের মিলিত রূপই স্বীকৃত। এখানে শিবই শক্তি, শক্তিই শিব। শক্তির দেবীরূপ উমার সাক্ষাৎ প্রথম 'কেন' উপনিষদে পাওয়া গেছে আগেই বলেছি। শশীভূষণ দাশগুপ্তের মতে এছাড়াও অন্যান্য উপনিষদ ও পুরাণে যেমন, ত্রিপুরোপনিষদ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, শিব পুরাণ, কালিকা পুরাণ ইত্যাদিতে উমার বিভিন্ন রূপ, যেমন কালী, হৈমবতী, দুর্গা, ভদ্রকালী প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এর পরবর্তী সময়পর্বে রামায়ণ ও মহাভারতে শিব-পার্বতীর উল্লেখ পাই।

সাংখ্য দর্শন এই শিব-পার্বতীর রূপকে স্থান দিয়েছে তাদের ভাবনায়। এর প্রবক্তা ছিলেন কপিল মুনি। গবেষক শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন বেদান্ত মতে ব্রহ্মই হল সত্য, বাকি সব মায়া বা প্রপঞ্চ। শঙ্করাচার্য বেদান্তের ভাষ্য রচনা করে এই মতকে প্রতিষ্ঠা দেন। তাদের মূল কথাই হল ব্রহ্মই এক এবং অদ্বিতীয়। উল্টো দিকে সাংখ্যে ব্রহ্মের একছত্র আধিপত্যকে অস্বীকার করে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্বকে। তন্ত্রের মত এখানেও প্রকৃতির গুরুত্বই বেশি। অনেকের মতে, বাংলাদেশে কপিল মুনির জন্ম বলেই হয়ত সাংখ্যে প্রকৃতির গুরুত্ব বেশি। প্রকৃতিই সৃষ্টি, ধ্বংস, শক্তি, সবকিছুর আধার। সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব তন্ত্রের শিব-শক্তির দ্বৈত মূর্তিকেই প্রতিভাত করে ভারতীয় ধর্ম-দর্শনে। এরপর শক্তির উল্লেখ আমরা পাই রামায়ণ ও মহাভারতে।

বাল্মীকি রামায়ণে পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমবানের কন্যা রূপে পাই উমাকে। উমাকে হিমালয় রুদ্রদেবের হাতে অর্পণ করেন। মহাভারতের আনুশাসনিক পর্বের বর্ণিত উমা-মহেশ্বর বা হর-পার্বতী সংবাদ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যে উমা ও শিব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে।[৪] সতী দেহত্যাগের পর গিরিরাজের গৃহে উমা রূপে জন্ম নেয়। অনেক তপস্যা করে নিজেকে শিবের যোগ্য করে তোলে। বিয়ের পর জন্ম হয় কার্তিকের। অর্থাৎ এখানে এসে পর্যন্ত আমরা শক্তিরূপে দেবীর উল্লেখ বলতে পর্বত কন্যারূপে উমা, দক্ষ কন্যা রূপে সতী, শিবের পত্নী ও কার্ত্তিক-গণেশের জননী হিসাবে পার্বতীকে পেলাম। বাংলায় শাক্ত সাধনায় উমার প্রাধান্য স্বীকৃত। এখন দেখা দরকার, উমা-পার্বতী-দুর্গা তন্ত্র সাধনায় কীভাবে কালী রূপে খ্যাতি অর্জন করল?

বাংলার শাক্ত সাধনার একমাত্র সর্বেশ্বরী দেবী কালিকা। বিভিন্ন পুরাণ-উপপুরাণে উমা-সতী-দুর্গার ধারা কালীর ধারার সঙ্গে মিশে শাক্ত সাধনায় কালীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কালীর কৃষ্ণ বর্ণ রূপ। এর প্রথম আভাসের কথা আগেই উল্লেখ করেছি বেদের রাত্রি সূক্তের মধ্যে। মহাভারতে এই কালীর সাক্ষাৎ পাই যখন অশ্বত্থামা পাণ্ডব শিবিরে রাত্রিতে প্রবেশ করে বীরগণকে হত্যা করে তখন। মার্কণ্ডেয় 'চণ্ডী'তে গিয়ে চণ্ডী ও কালীর পৃথক রূপের সঙ্গে সঙ্গে এদের মিলনের একটি ইতিহাস পাওয়া যায়।

অসুর বিনাশিনী চণ্ডীর সঙ্গে কালীও এখানে অসুরদের রক্তবীজ গ্রহণকারিণী হিসেবে উপস্থিত। কালীর ভয়ংকর রূপ ফুটে উঠেছে এখানে। কালীর এই ভয়ংকরী রূপ এবং তার পদতলে শিবের মূর্তিকেই সাধকরা তন্ত্র সাধনায় আশ্রয় করেছেন। প্রাচীন শিবের বর্ণনায় কালিকা শিবারূঢ়া নয়, শবারূঢ়া। পরবর্তীকালে দার্শনিক চিন্তায় প্রাধান্য পায় শবের শিবত্ব প্রাপ্তি। সাধকদের ব্যাখ্যায় দেখি শব শিব হয়ে ওঠে। রামপ্রসাদের গানে কালীর পায়ের স্পর্শে অসুরের শব শিবের রূপ ধারণ করেছে:

শিব নয় মায়ের পদতলে।
ওটা মিথ্যা লোকে বলে।।
দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে,
মা দাঁড়ায়ে তার উপরে,
মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহ
শিবরূপ হয় রণস্থলে।।[৫]

কালীর রূপের সম্পূর্ণ বর্ণনা পাই তন্ত্র সাধনার কোষগ্রন্থ 'মহানির্বাণতন্ত্র'-এ। এই গ্রন্থে কালীর ভয়ংকরী রূপ, সাধনার ইতিবৃত্ত, কালিকা তথা আদিশক্তির সাধনায় নারীদেহের ভূমিকা ইত্যাদি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এইভাবে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কালী তন্ত্র সাধনার প্রধান দেবী হয়ে ওঠে। বাংলাই এই শক্তি সাধনার পীঠস্থান। বাংলায় শক্তি সাধনা ব্যাপকতার পিছনে একটি বড় কারণ ছিল বৌদ্ধ ধর্মের তন্ত্রে আশ্রয় নেওয়া।

হিন্দু তন্ত্র সাধনার উদ্ভব ও বিস্তার মূলত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। প্রায় সমসাময়িক কালে বা তার কিছু আগে তন্ত্র সাধনা বৌদ্ধ ধর্মে আশ্রয় নেয়। অথর্ব বেদের সমসাময়িক কাল থেকেই সমাজে তন্ত্র-মন্ত্র, জাদু, ইন্দ্রজাল, বামাচার ইত্যাদি বহুল প্রচলিত ছিল। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে বুদ্ধের সময়কালে এই প্রবণতাগুলি সমাজে বর্তমান ছিল এবং সচেতন ভাবেই এর কিছু কিছু অংশ প্রবেশ করে বৌদ্ধ ধর্মে । সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 'তন্ত্রের কথা' বইয়ে বৌদ্ধ ধর্মে এই তন্ত্র-মন্ত্র কীভাবে প্রবেশ

করলো তার সুন্দর বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, 'এ সম্পর্কে আমরা অষ্টম শতকের বৌদ্ধপ্রধান শান্তরক্ষিতের কথা স্মরণ করছি। তাঁর মতে বুদ্ধদেবের জ্ঞাতসারেই এই-সব ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধসমাজে স্থান পেয়েছে। বুদ্ধদেবের জীবিতকালেই বৌদ্ধেরা তন্ত্র-মন্ত্রের চর্চা করত।'[৬]

বুদ্ধের মৃত্যুর পর নিজেদের পরস্পর বিরোধিতা থেকে বৌদ্ধ ধর্ম বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। শুরু হয় তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ। মতবিরোধ থেকে জন্ম নেয় দুটি সম্প্রদায়- হীনযান ও মহাযান। জাগতিক কামনা, মোহ, সুখদুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করলেই নির্বাণ প্রাপ্তি হবে- হীনযানদের ব্যাখ্যা ছিল এটাই। মহাযানপন্থীরা এই ব্যাখ্যা মানতে পারেননি। নাগার্জুনের 'মাধ্যমিককারিকায়ঃ'র ব্যাখ্যা গ্রহণ করলো মহাযানরা। এখান থেকেই জন্ম নেয় বজ্রযান শাখা। ধীরে ধীরে বজ্রযান আশ্রয় করল তন্ত্রকে। শুরু হল তান্ত্রিক বামাচার। বজ্রযান তন্ত্রকে আশ্রয় করে বেঁচে রইল পরবর্তী সময়ে।

আনুমানিক গুপ্ত যুগ থেকে হিন্দু ধর্মের উপর পৌরাণিক ধর্ম ও দেবদেবীর প্রভাব পড়তে শুরু করে। হিন্দু সংস্কৃতির শক্তিশালী প্রভাবে বহু বৌদ্ধ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে। বজ্রযানের সময়কালে পৌরাণিক সংস্কৃতি এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল, যে তারা হিন্দু দেবতার অনুকরণে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর উদ্ভব ঘটান। বামাচারের জনপ্রিয়তা বাড়ে। একই সঙ্গে চলছিল হিন্দু তন্ত্রসাধনাও। হিন্দু তন্ত্রসাধনা বহু কাল অবধি চলেছিল, কখনো প্রকাশ্যে। কিন্তু বৌদ্ধরা ক্রমশ বিলুপ্তির পথে চলে যেতে থাকে। সেন আমলে শাসকের বিরোধিতার কারণে বৌদ্ধ ধর্ম আরও বিলুপ্তির পথে চলে যায়। বাংলা ছেড়ে নেপাল, তিব্বত, চিনে আশ্রয় নেয়। দশম-দ্বাদশ শতকে চর্যাপদে এই সহজযানীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি। পরবর্তীকালে সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে শক্তি মঙ্গলকাব্যের দেবীদের মধ্যে আত্মগোপন করে আঠারো শতকে পুনরায় নিজের রূপে ফিরে আসে। শুরু হয় নতুন করে তন্ত্রসাধনা। আঠারো শতকের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ সেই ক্ষেত্রকে পুনরায় উন্মুক্ত করে।

এখন প্রশ্ন হল সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে শাক্ত সাধনা বিকাশ লাভ করলো না কেন? শাক্ত সাধন সংগীতগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখি সেখানে আছে জগৎ সংসার থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর ১৮৫৩-র ডিসেম্বর সংখ্যায় ঈশ্বর গুপ্ত প্রকাশিত একটি গানে এই কামনা ধ্বনিত হয়েছে। গানের শেষ চরণে কবি বলেছেন, তিনি কালীর চরণ আশ্রয় করেছেন। কারণ:

ভীম ভবার্ণব তারণহেতু
ওই যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন কুরু কৃপালেশ জননী কালীকে।।[৭]

মধ্যযুগের সূচনা পর্বে জগৎ ছেড়ে যাওয়া বা এই জীবন থেকে মুক্তির কামনা বড় হয়ে ওঠেনি। বরং মুসলমান আক্রমণে বিধ্বস্ত, ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ দেবতাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে। তারা চেয়েছে দেবীকে ভয়ংকর শক্তি হিসেবে দেখতে। যে শক্তি বিধর্মী শাসককে পর্যন্ত বাধ্য করে হিন্দু দেবীর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে।

এই সময়ে শক্তি সাধনার উদ্ভব না হওয়ার পিছনে বড় কারণ ছিল শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব ধর্ম। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে চৈতন্যের আন্দোলন ছিল ব্রাহ্মণ ও বিধর্মী শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানবতার লড়াই। এই দুইয়ের বিরুদ্ধে চৈতন্য আপামর গরীব, অচ্ছ্যুত, নিপীড়িত, শোষিত, সমাজের প্রান্তবর্তী, এমনকি অন্য

ধর্মের নিপীড়িত মানুষকেও মানব প্রেমে নিজের দলে টেনেছিলেন। পরবর্তী সময়ে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা চৈতন্যের মানব প্রেমের ধর্মকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের শাস্ত্রীয় রূপ দিলেন। নবদ্বীপসহ বাংলা, বৃন্দাবন সব জায়গা চৈতন্যের ভক্তিধর্মে প্লাবিত হয়ে উঠল। এই প্রেম ও ভক্তির প্রাবল্যে কেবল সমাজে নয়, সাহিত্যেও বৈষ্ণবতাকে ছাপিয়ে কিছু রচিত হওয়া সম্ভব ছিল না।

আঠারো শতকের শুরুতে গিয়ে এই বৈষ্ণবীয় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হল বাংলার সমাজ ও সাহিত্য। শুরু হল অন্য ধারার সাহিত্য রচনা। লেখা হতে থাকল 'শিবায়ন', 'ধর্মমঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল', শাক্ত সাহিত্য ইত্যাদি। বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্য বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদল হল সমাজের ধর্মীয় প্রেক্ষাপটেরও। শাক্ত ও তন্ত্র সাধনা পুনরায় জেগে উঠল এই শতকে। শাসকের অত্যাচার ও তাদের শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট মানুষ কালীকে মা ও মেয়ের সম্পর্কে বেঁধে মুক্তি পেতে চাইল। বৈষ্ণব ধর্মে এই মুক্তির কথা ছিল না। ছিল আজীবন রাধাভাবে বা সখীভাবে ভক্তের ভগবানকে জন্মজন্মান্তর ধরে সেবা করে যাবার কামনা। এই শতকে এসে মানুষ সেই ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তি চাইল মায়ের কাছে।

এই মুক্তি কামনার ব্যগ্রতা লুকিয়ে আছে এই সময়ের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের দলিলে। আঠারো শতকে শাক্ত সাধনা পুনরায় তন্ত্র সাধনার মধ্যে দিয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার প্রধান কারণ ছিল এই সময়ের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় পরিবেশ। এই শতকের শুরুতে ১৭০৭-এ ঔরংজেবের মৃত্যুর পর বাংলায় স্বাধীন নবাবি আমল শুরু হয়েছে। মুর্শিদকুলি প্রথমে নায়েব-নাজিম, তারপর হলেন স্বাধীন নবাব। জমিদারি সংস্কার সাধনের মধ্যে দিয়ে তৈরি করলেন নতুন জমিদার শ্রেণি। আস্থা রাখলেন হিন্দু জমিদার ও প্রশাসকের উপর। রাষ্ট্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে তিনি হিন্দুদের অগ্রাধিকার দিলেন। এই রীতি আলিবর্দির সময় পর্যন্ত বহাল ছিল। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজেও প্রাধান্য বিস্তার করেছিল হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ও পৌরাণিক সংস্কৃতি। সমাজে ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি ও বিধিনিষেধ জনজীবনকে আবার আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। লোকদেবতার পরিবর্তে পুরাণের দেবতা সমাজে প্রধান হয়ে উঠল। বেড়ে গেল বাল্য বিবাহ, গৌরীদান প্রথা, কৌলীন্য প্রথার মতো সামাজিক সংস্কার। সমাজের ও মানুষের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠল পৌরাণিক সংস্কৃতি। এই শতকে তন্ত্র সাধনার উদ্ভবের এই ধর্মীয় পালাবদল ছিল একটি প্রধান কারণ।

এই শতকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন মানুষের জীবনে বড় প্রভাব ফেলেছিল। ইতিহাসের তথ্য থেকে জানা যায়, সুজাউদ্দিন তার শাসনকালে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ কর মোঘল সম্রাটকে প্রদান করত। এই বিপুল পরিমাণ টাকা জমিদারদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর হিসেবে আদায় করা হত। স্বাভাবিক ভাবেই প্রজাদের দুঃখ কষ্টের শেষ ছিল না। এর উপর আলিবর্দির সময় কালে বর্গির আক্রমণ। দীর্ঘ নয় বছর ধরে চলা বর্গিদের ধ্বংসলীলায় বিপর্যস্ত হয়েছিল বাংলার অর্থনীতি। ১৭৫৭-য় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা দখল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে আরও ভঙ্গুর করে তুললো।

দেওয়ানি লাভের পর রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়েছিল বিপুল হারে। ফলস্বরূপ দেখেছি ১৭৭০-এর দুর্ভিক্ষ। অধিকাংশ মানুষ রাজস্বের চাপে নিঃস্ব হয়ে না খেতে পেয়ে মারা গেল। ক্রমশ নতুন নতুন রাজস্ব নীতি আসতে লাগল। পাঁচশালা, দশশালা, চিরস্থায়ী প্রভৃতি বন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে সংস্কার সাধন হল জমিদারি ব্যবস্থার। পুনরায় নতুন করে জন্ম নিল জমিদার শ্রেণি। এদের রাজ্যপাট গ্রামের জমিদারিতে, অথচ জীবনযাপন, বসবাস, বিলাসিতা সবকিছু নগর কলকাতায়। এদের বিলাসিতার টাকা যোগাতো নিঃস্ব-প্রায় প্রজারা।

প্রজাদের জীবনে এই দুর্দশা হয়ত আগেও ছিল। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনে রাষ্ট্রীয় নীতির এমন প্রত্যক্ষ প্রভাব আগে দেখা যায়নি। এই শতকের পূর্বে মধ্যযুগের কোন সাহিত্যে এমন ভাবে উঠে আসেনি ব্যক্তি জীবনের দুঃখ, কষ্ট, না পাওয়ার বেদনা। রামপ্রসাদই প্রথম ব্যক্তি জীবনের দুঃখের কথা মাকে জানালেন। এর আগেও মঙ্গলকাব্যে দেখেছি ভক্তের দুঃখে কাতর হয়ে দেবতা অফুরান সম্পত্তি দিয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্যেও দেখেছি ভক্তের ভগবানকে পাওয়ার আকুতি। কৃষ্ণ প্রেমে বিরহী রাধাকে। সেখানে ছিল না ভোগের কোন চিহ্ন নেই। এই শতকে এসে জীবনে দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে এল ভোগ। দেবতার বদলে জীবনের নিয়ন্তা হল মানুষ, তার পুরুষাকার। এই পুরুষাকারের উপর ভিত্তি করেই নগর কলকাতায় জন্ম নিল 'বাবু' সম্প্রদায়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নতুন জমি নীতির ফলে এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নিঃস্ব মানুষের জীবনের অন্ধকারের বিনিময়ে নগরে জ্বলে উঠেছিল কিছু মুষ্টিমেয় মানুষের জীবনের বিলাসিতার রোশনাই। তারা জমিদারি কিনলেন গ্রামে। রইলেন নগর কলকাতায়। এই নাগরিক বাবুরা হয়ে উঠল উঠতি পুঁজিপতি। নগর কলকাতা হয়ে উঠল 'বাবু'দের বিলাসিতার রঙ্গভূমি। কোম্পানির শাসনকালে কিছু মানুষ নতুন জমিদারি পেয়ে এবং কিছু মানুষ কোম্পানির ব্যবসার সহায়ক হিসেবে নিজেদের বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী করে তুলেছিল। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে এই শতকের মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রক যে মানুষই, দেবতা নয়, তা স্পষ্ট হবে।

গবেষক লোকনাথ ঘোষের লেখা 'The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars & C' এবং 'কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত' বইয়ে কলকাতার বাবুদের হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠার ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। গোবিন্দরাম মিত্রের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, গোবিন্দরাম ছিলেন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেতনভুক কর্মচারী। বেতন ৫০ টাকা। পরে ব্রিটিশের কল্যাণে জমিদার হন। সমসাময়িক কালে তার প্রতিপত্তি বোঝাতে একটি ছড়া রচিত হয়:

(a) Govinda Ram's Chari (i. e.) rod.
(b) Banamali Sirkar's Bari (i. e.) house.
(c) Omi Chand's Dari (i. e.) beard.
(d) Jagat Sett's Kauri (i. e.) money.[৮]

কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 'কান্তমুদি', কৃষ্ণকান্ত নন্দী পলাশির যুদ্ধের পূর্বে ওয়ারেন হেস্টিংসকে সিরাজের হাত থেকে বাঁচিয়ে ব্রিটিশ আমলে প্রভূত সম্পত্তির মালিক হন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের ঘনিষ্ঠ কর্মচারী। রানাঘাটের পাল-চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামান্য পানের ব্যবসায়ী কৃষ্ণচন্দ্র পান্তি। রামপ্রসাদের গানের এই কৃষ্ণ পান্তির কথা পাই। এছাড়াও আরও বহু ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ব্রিটিশের ছত্রছায়ায় থেকে নিজেদের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি বাড়িয়েছিলেন। এইগুলির মধ্যে দিয়েই প্রমাণিত হয় আঠারো শতকে এসে মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে নিতে শুরু করেছিল। নির্ভর করেনি কালকেতুর মতো চণ্ডীর বর দানের উপর। দেবতার স্থালে মানুষের ভূমিকা বেড়েছিল এই সময়ে। তাই রামপ্রসাদের হাত ধরে প্রথম পেলাম ব্যক্তির নিজের জীবনের কথা। সাহিত্য বাস্তবের মাটিতে পা রাখল।

একদিকে নিঃস্ব মানুষের জীবনে রাজা-জমিদার-কোম্পানির অত্যাচার, অন্যদিকে এদেরই টাকায় শোষক শ্রেণির বৈভব বদলে দিতে শুরু করলো মধ্যযুগের সমাজ কাঠামোকে। তাই শাক্ত পদকাররা দেবতাকে সামনে রেখে তাকে নিজের ঘরের মানুষ করে তুললেন। শোনালেন মায়ের প্রতি দোষারোপের সুর। রামপ্রসাদ গেয়ে উঠলেন:

প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁর নামেতে নিলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলে জমিদারী।।
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী।।[৯]

রামপ্রসাদের আগে নিজের জীবনের দুর্দশার জন্য দেবতাকে এমন অভিযোগ করতে দেখা যায়নি। এটা সম্ভব হয়েছিল কেবল মাত্র সময় ও সমাজের পরিবর্তনের ফলে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, শাক্ত সাধনা ও তাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের উদ্ভবের পিছনে বড় ভূমিকা পালন করেছিল আঠারো শতকের রাষ্ট্রীয় পালাবদল ও ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির পটপরিবর্তন। এই সময় পর্বে যারা শাক্ত পদ লিখেছিলেন তাদের অন্যতম হলেন রামপ্রসাদ।

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার ১২৬০-এর ১লা পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় ঈশ্বর গুপ্ত 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন' নামে দুটি প্রবন্ধে রামপ্রসাদের জীবনী ও অনেকগুলি গান প্রকাশ করেন। রামপ্রসাদ চর্চায় এটিই প্রথম আলোচনা। রামপ্রসাদের জন্মের সময়কাল নিয়ে বিতর্ক বহু দিনের। তার প্রথম জীবনীকার ঈশ্বর গুপ্ত এই বিষয়ে নীরব থাকায় তৈরি হয়েছে আরও বেশি বিভ্রান্তি। প্রভাকরের ১লা পৌষ সংখ্যায় 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন' প্রবন্ধের শেষ অংশে তিনি বলেছেন, '৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রসাদ সেন মায়িক সংসার পরিহার পূর্ব্বক নিত্যধামে যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবেক না।'[১০] 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ১৩০২-য়ের কার্ত্তিক সংখ্যায় দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় রামপ্রসাদের জন্ম সম্পর্কে বলেছেন, আনুমানিক ১১২৫ থেকে ১১৩০ বঙ্গাব্দের কোন এক সময়ে হালিশহর কুমারহট্ট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।[১১] দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় ঈশ্বর গুপ্তের মতকে সামনে রেখে যে দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করেছেন, তাকেই আমাদের সমীচীন বলে মনে হয়। তার মতে রামপ্রসাদের জন্ম ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৭৮১-তে।

অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়ে সংসারের আর্থিক দায়িত্ব চাপে তার উপর। কলকাতায় গিয়ে কোন ধনী ব্যক্তি বা জমিদারের বাড়িতে মুহুরির কাজ নেন। ঈশ্বর গুপ্ত দুই জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলতে চেয়েছেন, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কারো একজনের বাড়িতে কাজ করতেন। তাদের মধ্যে একজন খিদিরপুরের জমিদার গোকুলচন্দ্র ঘোষাল। অপর জন কলকাতার দুর্গাচরণ মিত্র। সমালোচকরা এই দুই ব্যক্তিকে নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। দুর্গাচরণ মিত্রের বাড়ির কাজের কোন প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে গোকুলচন্দ্রের বাড়িতে যে তিনি কাজ করতেন না তার বড় প্রমাণ বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল' কাব্য। 'তীর্থমঙ্গল' কাব্য গোকুলচন্দ্রের ভাই কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। রামপ্রসাদের মতো মানুষের উল্লেখ পর্যন্ত নেই এই কাব্যে। তাই তিনি কোথায় কাজ করেছিলেন, আজ পর্যন্ত সেই বিতর্কের অবসান সম্ভব হয়নি।

যাই হোক, তিনি যে প্রথমাবধি কালীর নামে পাগল ছিলেন এ কথা জীবনীকারেরা বলে গেছেন। সংসারের অনটন সত্ত্বেও কাজে মন ছিল না তার। মন মায়ের ভাবে বিভোর। আজীবন কাল সংসারে বিরাগী থেকে গেছেন। তার মুহুরিগিরির খাতায় যে গান লিখেছিলেন, তাতে স্পষ্ট যে তিনি সংসারের মায়ায় নিজেকে বাঁধতে চাননি। গুপ্ত কবি প্রভাকর পত্রিকার পাতায় গানটি উল্লেখ করেছেন:

আমায় দেও মা তবিল্ দারী।
আমি নিমক্ হারাম্ নই শঙ্করী।
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ্ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখো তাঁরি।।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়্গির, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনায়্ চাকর কেবল্ চরণ ধূলার অধিকারী।।[১২]

রামপ্রসাদ একদিকে সংসার, টাকাকড়ি, জগতের মায়া বন্ধন সবকিছু ছেড়ে মায়ের পায়ে আশ্রয় নিতে চান। অন্যদিকে তিনিই আবার মায়ের কাছে দোষারোপ করেন তাকে গরীব করে রাখার জন্যে।

তার জীবনটা পুরোটাই ছিল আঠারো শতকের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ইতিহাসের উত্থান-পতনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত। তিনি নিজে জমিদারির মুহুরির কাজ করেছেন। ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত। কৃষ্ণচন্দ্র তাকে রাজসভায় স্থান দিতে চাইলে তা তিনি পরিত্যাগ করেন। নবদ্বীপরাজ তাকে নিষ্কর জমি লিখে দেন। জনশ্রুতি আছে তিনি মাঝে মাঝে কুমারহট্ট আসতেন রামপ্রসাদের গান শুনতে। কথিত আছে নবাব সিরাজদ্দৌলা নৌকাযোগে যেতে যেতে রামপ্রসাদের গান শুনে তার কাছে যান। সিরাজও তার গুণমুগ্ধ ছিলেন।

তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন সমাজের পরিবর্তনকে। মানুষের দারিদ্রপূর্ণ জীবন, নিঃস্ব অসহায়ের কাতর আর্তি তিনি মায়ের কাছে তুলে ধরেছেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জীবন যন্ত্রণা উঠে এসেছে তার গানে। মাকে অভিযোগ জানিয়ে বলেছেন:

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ সংসারী।।
অর্থ বিনা, ব্যর্থ যে, এ সংসারে সবারি।
ওমা তুমিও কন্দোল করেছ বোলে শিব ভিখারী।।[১৩]

এই অভিমান, লুকিয়ে থাকা যন্ত্রণা আঠারো শতকের ব্যক্তি মানুষের জীবন যন্ত্রণা। মধ্যযুগের সাহিত্যে এতদিন নিজের দুঃখ-দারিদ্রের কথা দেবতার সামনে উপস্থাপন করা হত। কিন্তু এই প্রথম নিজের দারিদ্রের জন্য দেবতাকে অভিযুক্ত করা হল।

সাধক কবির রচনায় সাধনার কথাই বলা হয়েছে বাস্তব জীবনের আড়ালে। তবু যে সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি লিখছেন, সেই সময়ের অভিঘাত তার সাহিত্যে আসবে এটাই স্বাভাবিক। একটি গানে দেখি রামপ্রসাদ অন্নের জন্যে হাহাকার করছেন। গানের আর্তি বুঝিয়ে দেয় মানুষের অন্নহীন জীবনের যন্ত্রণার কথা:

অন্ন দে গো অন্ন দে গো অন্ন দে গো অন্নদা।

কবি অন্ন চেয়েই থামেননি। কালীর উপর অভিমান করে 'মা' বলে না ডাকার স্পর্ধা দেখিয়েছেন। এই স্পর্ধাই আঠারো শতকের নতুন সুর। তিনি কালী মায়ের কাছে অভিযোগ করেছেন বারবার। বলেছেন:

মা মা বলে আর ডাকব না।
ও মা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।।
ছিলেম গৃহবাসী বানালে সন্ন্যাসী
আর কী ক্ষমতা রাখো এলোকেশী।
ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষা মেগে খাব
মা বলে আর কোলে যাব না।।[১৪]

পদকার আর পাঁচটা মানুষের মতই সাংসারিক জীবন দুঃখের কাটিয়েছেন।

এই শতকের ইতিহাসে দেখেছি ব্রিটিশের ছত্রছায়ায় কেউ কেউ বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। আবার সেই ব্রিটিশের অত্যাচারেই লক্ষ লক্ষ মানুষ নিরন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। শোষণ, ভোগ, বিলাসিতা এত কিছুর মাঝে তিনি মায়ের চরণ ধরে জাগতিক কামনা-বাসনাকে তুচ্ছ করেছেন। তার গানে যেমন না পাওয়ার জন্য অভিমান আছে, মায়ের একতরফা আশিসে কাউকে কাউকে বড়োলোক করার প্রতিও আছে অনুযোগ। তেমনি আছে জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত কবির কালী মায়ের পায়ে শান্ত সমাহিত হওয়ার আকুতি। শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, 'রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত গানগুলিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, রামপ্রসাদের মাতৃ-বিশ্বাস কোনও গোষ্ঠী-চেতনালব্ধ জিনিস নহে; রূঢ় বাস্তব জীবনের অগ্নিদাহে ইহার খাদ পোড়ান হইয়াছে, জীবন-জিজ্ঞাসা-জনিত ঘনীভূত সংশয়ের কষ্টি-পাথরে ইহার সারবত্তা বার বার পরীক্ষিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকের বাঙালী নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের সমগ্র জীবনব্যাপী বাঁচিবার সংগ্রামের সমস্ত আঘাতকে সহ্য করিয়া তবে রামপ্রসাদকে এই "মা" নামে অটল থাকিতে হইয়াছে।'[১৫]

জীবনে দুঃখ এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে, তিনি আর দুঃখে কষ্ট পান না। দুঃখকে মেনে নিয়েছেন জীবনের সঙ্গী হিসেবে। দুঃখের মধ্যে দিয়েই তাকে জয় করতে চেয়ে কালী মাকে বলেছেন:

আমি কি দুখেরে ডরাই?
দুখে দুখে জন্ম গেল,
আর কত দুখ দেও দেখি তাই।[১৬]

এই জায়গাতেই গানগুলি সাধনা সংগীত হয়েও হয়ে উঠেছে জীবন আশ্রয়ী। জীবনের ছোট্ট ছোট্ট বিষয়, পরিবার জীবনের ছোটছোট সুখ-দুঃখও কবির চোখে ধরা পড়েছে। ভানুমতির খেল, ঘুড়ি ওড়ানো, লাটাই, কলুর বলদ, পাশাখেলা, জমিদারি, কেরানিগিরি, মজুর খাটা-এই সব মিলিয়ে পদগুলি জীবনের কাব্য হয়ে উঠেছে।

এই শতকের সময়টা ছিল ব্রাহ্মণ্য ও সনাতন ধর্মের আধিপত্যের যুগ। বৈষ্ণব ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদী হয়ে পড়েছে। প্রবল ছিল শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষণা করেছেন কালী পুজো না করলে

কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। তার ভয়ে বৈষ্ণবরা দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে আছে। এমনই পরিস্থিতিতে রামপ্রসাদের কণ্ঠে শুনলাম শাক্ত-বৈষ্ণবের মিলনের বাণী। তিনি গাইলেন যেই শ্যাম, তিনিই শ্যামা:

কালি ব্রহ্মময়ী গো!
বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ তলাসি।।
মহাকালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী।।
শিবরূপে ধর শিঙ্গ, কৃষ্ণ রূপে ধর বাঁশী।
ওমা রাম রূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি।।
দিগম্বরী দিগম্বর পীতাম্বর চির বিলাসী।
শ্মশান বাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী।।[১৭]

তিনি শাক্ত গানে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন। উনিশ শতকে যে ব্রাহ্ম ধর্মের পথ চলা শুরু হচ্ছে একেশ্বরবাদকে সামনে রেখে, তার বহু বছর আগে রামপ্রসাদ শক্তি দেবীকে সকল দেবতার সঙ্গে এক করে দেখিয়ে সেই একেশ্বরবাদের সূচনা করছেন।

রামপ্রসাদের আগমনী বিজয়ার গানগুলির দিকে তাকালেও দেখি সেখানে দুটি দিক উঠে এসেছে। এক. সাধন তত্ত্ব, দুই. বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ছবি। এই পর্যায়ের গান রচয়িতারা সবাই সাধক ছিলেন না। কেউ কেউ শুধু কবি ছিলেন। পদগুলি তাই লীলাসংগীতের থেকে বেশি হয়ে উঠেছে বাঙালির ঘরের গান। যে সময়ে গানগুলি লেখা হচ্ছে সেই সময়ের সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি ও কৌলীন্য প্রথার দাপট ছিল প্রবল, একথা আগেই বলেছি। গৌরীদান প্রথার কবলে পড়ে বাবা মা বাধ্য হত আট বছরের শিশু কন্যাকে বিয়ের আসরে বসাতে। একদিকে আট বছরের শিশুকন্যা, অন্যদিকে আশি বছরের কুলীন বর। মেয়ের জীবনের থেকেও বড় ছিল পারিবারিক ও সামাজিক সম্মান রক্ষা। উনিশ শতকের সমাজ ইতিহাস পাঠে জানি, এক একজন কুলীন একশো'র উপর বিয়ে করত। বিয়ের দিনটি বাদে স্ত্রীর সঙ্গে আর দেখা হত না কোনোদিন। এমনই সামাজিক যন্ত্রণার শিকার হয়েছিল সেই দিনের বাঙালি পরিবার। আগমনী বিজয়ার উমা-মেনকা-গিরিরাজের কাহিনির আড়ালে গানগুলিতে উঠে এসেছে এই জীবনযন্ত্রণার ছবিগুলি।

শিব-পার্বতীর দাম্পত্য জীবনের কলহ, দারিদ্রতা, প্রেম মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা দেখে এসেছি। একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত, মধ্যযুগের সূচনা পর্বে বা মধ্য সময়ে শিব-পার্বতীর সংসারের দারিদ্রের ছবি ও তৎজনিত কলহ-বিবাদ সেভাবে চোখে পড়ে না। সময় যত আঠারো শতকের দিকে এগিয়ে এসেছে, তত বেড়েছে তাদের দারিদ্র জনিত কলহের চিত্র। রামেশ্বরের 'শিবায়ন', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যে এই দারিদ্র যেন অনেক বেশি করে সময়ের দারিদ্রকে তুলে ধরেছে। শাক্তপদে এসে এই জটিল সমস্যা এবং সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিনিষেধগুলি আরও বেশি করে উঠে এল। এই সময়ের মানুষের জীবনে দারিদ্রের যন্ত্রণার সঙ্গে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, কৌলীন্য, গৌরীদান প্রথার মতো সামাজিক সংস্কারগুলি সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। সময়ের এই সামাজিক সংকটগুলিকে ধারণ করে আছে আগমনী-বিজয়ার পদে মেনকা-উমা-শিব-গিরিরাজের কাহিনি।

গিরিরাজ-মেনকার একমাত্র আদরের কন্যা উমা। আট বছরের শিশুকন্যা পুতুল খেলে। পিতার কাছে বায়না ধরে চাঁদ ধরে দিতে হবে। হাতে চাঁদ না পেয়ে উমার কি কান্না। অনেক কষ্টে মেনকা তাকে ঘুম পাড়ায়। আদরের কন্যার ঘুম ভাঙাতে চায়না মা:

আর জাগাস্ নে মা জয়া, অবোধ অভয়া,
কত করে' উমা এই ঘুমাল।
মা জাগিলে একবার, ঘুমপাড়ানো ভার-
মায়ের চঞ্চল স্বভাব আছে চিরকাল।[১৮]

এই বাৎসল্য বাঙালির স্বভাবজাত। বৈষ্ণব পদাবলিতেও দেখেছি কৃষ্ণের বাল্যকালের আদর, আবদার, দুষ্টুমি, চঞ্চলতা। তাই বৈষ্ণব পদাবলির আলোকে উমার বাল্যকালের ছবি ফুটিয়ে তুলতে কবিদের কোন অসুবিধা হয়নি। দেবতার লীলাকে অনায়াসে শাক্ত পদকাররা মানবলীলায় পরিণত করেছেন।

উমার শিশুকাল কেটে ওঠার আগেই বাবা মায়ের চিন্তা শুরু হয় গৌরীদানের। নারদের ঘটকালীতে বিয়ে হয়ে যায় কুলীন বর শিবের সঙ্গে। শিব দরিদ্র। শ্মশানে-মসানে থাকে। ভিক্ষা করে খায়। তার উপর বিবাহিত। তার সব দোষ গুণে পরিণত হয় কৌলীন্যের খাতিরে। বিয়ের পর আদরের দুলালী যায় স্বামীর ঘর করতে। গিয়ে দেখে থাকার ঘর নেই। স্বামী থাকে শ্মশানে। সে ভিখারি, আপনভোলা। সংসারে মতি নেই। শুরু হয় উমার সতীনের ঘর করা। এ তো গেল কুলীন ঘরের কন্যার শ্বশুরবাড়িতে যন্ত্রণার ছবি। অন্যদিকে মেয়ের বিয়ে দেবার পর শিশুকন্যার জন্যে মায়ের চিন্তার শেষ থাকে না। একবছর হয়ে গেলেও কন্যা বাপের বাড়ি আসেনি। মায়ের চিন্তা বাড়ে। গিরিরাজও আর পাঁচটা বাঙালি পিতার মতই অলস। মেয়ের বিয়ে দেবার পর নিশ্চিন্তে থাকে চায়।

কিন্তু মায়ের মন মানে না। মেয়ের চিন্তায় মা রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে। 'আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে। গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে!' গিরিরাজকে তাড়া দেয় মেয়েকে আনার। কমলাকান্তের একটি পদে দেখি, মেনকা গিরিরাজকে বলেছে:

কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রোয়েছো ঘরে;
কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে।[১৯]

মেয়ের জন্যে এই চিন্তা আপামর বাঙালি মায়ের চিন্তা। এখানেই মেনকা, গিরিরাজ, উমা স্বর্গ থেকে মর্তে নেমে এসেছেন। শাক্ত পদকাররা সমকালীন ব্যক্তি জীবনের দুঃখকে দেবতাকে জানাতে চান তাদের দুঃখ-যন্ত্রণাময় সংসারের মধ্যে হাজির করিয়ে। মানুষের দারিদ্রকে দেবতার করে তোলেন। পদকাররা এইভাবে তাদের সাধন তত্ত্বকে বাঙালির পরিবার জীবনের আলোকে উপস্থাপন করেছেন।

বৎসরান্তে উমা এসেছে বাপের বাড়ি। বাবা-মা মেয়েকে দেখতে যায়নি বহু দিন। বছর পেরিয়ে গেলেও যায়নি আনতে। তার জন্যে মেয়ের অভিমান। গিরিরাজ মেনকার জ্বালায় বাড়ি থেকে বের হত মেয়েকে আনতে যাচ্ছি বলে। কিন্তু বাইরে ঘুরে ফিরে চলে আসত। এই স্বভাব তো কোন দেবতার নয়। একান্ত অলস বাঙালির কথা। অবশেষে এক বছর পর উমা বাপের ঘরে এসেছে। মায়ের সঙ্গে, পাড়াপড়শির সঙ্গে কত জমানো গল্প। মা জিজ্ঞাসা করেছে স্বামী কেমন আছে! মেয়ের মুখে শুনতে চায় শিবের দারিদ্রের কথা।

কিন্তু উমা বাঙালি কন্যা। বাঙালি বধূ। সমাজ তাকে শিখিয়েছে স্বামীর নিন্দা করতে নেই। তাই সে মিথ্যা করে স্বামীর অযুত সম্পত্তির বর্ণনা করে মায়ের চিন্তার মুক্তি ঘটাতে চায়। বজায় রাখতে চায় বাঙালির বধূ সত্ত্বাকে। সে এখন আর শুধু উমা নয়, নয় মেনকার কন্যা। সে এখন শিবের পত্নী, কার্ত্তিক-গণেশের জননী। সে স্বামীর দারিদ্র লুকিয়ে মাকে বলে:

কে বলে দরিদ্র হর, রতনে রচিত ঘর মা,
জিনি কত সুধাকর শত দিনমনি।
বিবাহ-অবধি আর কে দেখেছে অন্ধকার,
কে জানে কখন্ দিবা কখন্ রজনী।।[২০]

মিথ্যা বলে মায়ের চিন্তা মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি বধূ হিসেবে নিজের চরিত্রকে বজায় রেখেছে উমা। কবিরা এভাবেই প্রথমাবধি সবাইকে বাঙালির ঘরের মানুষ করে নির্মাণ করেছেন।

কন্যা আসার পর আনন্দ-হুল্লোড়ে কেটে গেছে চারদিন। এরপর যাবার পালা। নবমীর দিন থেকেই মা কামনা করতে থাকে যেন রাত্রি না ফুরায়। রাত ফুরালেই কন্যাকে বিদায় দিতে হবে। আবার মেয়ে গিয়ে পড়বে ভিখারি শিবের ঘরে। মেনকা তাই প্রার্থনা করে 'ওরে নবমী নিশি, না হইও রে অবসান।' মেনকা যেতে দিতে চায় না। কিন্তু উমার গরজ। ফিরতেই হবে কৈলাস। শিব ভিখারি হলেও রুদ্রচণ্ড মেজাজ। না গেলে অশান্তি। তাছাড়া স্বামীর ঘর এখন তার নিজের সংসার। তাই শিব নিতে না এলেও তাকেই যেতে হয়। কারও কারও গানে শিব আনতে আসে উমাকে। এও তো বাঙালির সামাজিক পরম্পরা। রামপ্রসাদের পদে দেখি:

বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গনেশ-মাতা, ডাকে বার বার।
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায়, একি বিড়ম্বনা বিধাতার।[২১]

আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের পদে পদকাররা এইভাবে দেবতাকে সমকালীন সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিয়েছেন।

আগমনী-বিজয়ার গানে শুধু যে বাস্তব পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে কবিরা তুলে ধরেছেন, তা নয়। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে সাধনতত্ত্বও। সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্য কমবেশি ধর্মকেন্দ্রিক। কিন্তু মেনকা-উমা-শিবকে নিয়ে এমন রচনা চোখে পড়েনি এর আগে। এটা হয়েছে সময়ের প্রভাবে তা আগেই বলেছি আমরা। ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কৃষ্ণের বাল্যলীলা রয়েছে। রয়েছে প্রেম ও মধুর রস আশ্রয়ী বৈষ্ণবীয় সাধনা। শক্তির সাধনায় এসে দেবতার ভাবনায় বদল ঘটলো। দেবী হয়ে উঠলেন কখনো মা, কখনো মেয়ে। আগমনী-বিজয়া পর্যায়ে দেবী মেয়ে হয়ে ধরা দিলেন। রচিত হল দেবতা-মানবের মেলবন্ধন।

উমা সপ্তমীতে এলে সবাই মাতৃভাবে তাকে বরণ করেন। প্রেমের আদরে দেবীকে করে তোলেন নিজের ঘরের মেয়ে। সেই মেয়েই আবার রামপ্রসাদকে বেড়া বাঁধতে সুতো এগিয়ে দেন। উমার এমন লীলা মধ্যযুগে আমরা দেখিনি। তাই উমা যখন নিজের আদিশক্তি রূপে বাপের বাড়ি আসে, মা তাকে চিনতে

পারে না। তাকে ফিরে আসতে হয় মেয়ের রূপে। রামপ্রসাদের গানে মেনকা উমার এমন রণরঙ্গিণী রূপ দেখে চিনতে পারেনি। মেনকা উমার এমন রূপ দেখে বলেছে:

বামা ও কে এলোকেশী।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী ভৈরব যোগিনী
রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে।।
কাহার নারী রে চিনিতে নারি রে
মোহিত করেছে ছিন্ন বেশে।।[২২]

সাধকরা এই পর্যায়ের গানে দেবীর মানব লীলার সাধনা করেছেন প্রেমভাবে। সাধনার এই রূপের বদল হয়েছিল এই শতকের দেব-ভাবনার বদলের ফলেই। এই বদল দেখেছি 'শিবায়নে', 'অন্নদামঙ্গল'-এ। ফলত সবদিক থেকেই এই পর্যায়ের পদগুলি হয়ে উঠেছে সমকালীন সময়ের ফসল। শক্তির সাধনতত্ত্বের গানগুলিও এর অন্যথা নয়।

সাধনতত্ত্বের গানগুলিতে সাধক ও পদকাররা তুলে ধরেছেন দেবীর স্বরূপ, সাধনার প্রণালী ও পদ্ধতি, জাগতিক মোহ-কামনা-বাসনা থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। পদকারদের মধ্যে সবাই সাধক ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। যারা তন্ত্র সাধক, তাদের গানেই বেশি করে উঠে এসেছে দেহ ও তন্ত্র সাধনার উপায়গুলি। আর যারা সাধক নন, তারা জগজ্জননী মায়ের কাছে করেছেন মুক্তির প্রার্থনা। রামপ্রসাদের আগে শক্তির সাধনা এই দুই ভাগেই বিভক্ত ছিল। একটা তন্ত্রাশ্রয়ী গুহ্য সাধনা, অপরটি কালী মায়ের পুজোর মধ্যে দিয়ে আরাধনা।[২৩]

রামপ্রসাদকে সাধক কবি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি তন্ত্র সাধক ছিলেন কিনা এ বিষয়ে স্থির কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি গবেষকরা। তাই তার গানে সাধনার কথা এলেও, তিনি শ্মশানে শব সাধনা, ভৈরবী চক্রের সাধনা, পঞ্চ-ম'কারের সাধনা যে করেননি তার প্রমাণ পাই একটি গানে। সেখানে রামপ্রসাদ বলেছেন:

ওরে সুরাপান করি নে আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।
মনমাতালে মাতাল করে, মদমাতালে মাতাল বলে।

এই শতকটা ছিল হঠাৎ করে হয়ে ওঠা ধনীদের বিলাসিতার সময়। ভোগের সময়। একদিকে ভোগ, অন্যদিকে নিরন্ন মানুষের হাহাকার। এতদিন জমিদার ও প্রতিপত্তি শ্রেণির নেশার জিনিস ছিল ভাঙ, গাঁজা, সিদ্ধি ইত্যাদি। কোম্পানির আমলে এইগুলির জায়গা দখল করে সুরা। সমাজে সুরাপানের প্রবণতা বাড়ে। উনিশ শতকে 'সুরাপান নিবারণী সভা'র প্রতিষ্ঠা থেকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে টের পাওয়া যায়। এ তো গেল সমাজের দিক। অন্যদিকে তন্ত্র ও দেহ সাধনায় সাধকরা সুরা পান করতেন সাধনার একটি অঙ্গ হিসেবে। এই সময়ে তন্ত্র সাধনা কেবল শক্তি সাধনায় সীমাবদ্ধ ছিল না। আশ্রয় করেছিল তন্ত্র ও দেহ সাধনাকে। রামপ্রসাদ এমন আবহাওয়ায় শক্তির সাধনা করেছেন ভাবের পূজারি হয়ে। গুহ্য তন্ত্রের সাধক হয়ে নয়। তিনি সুরা পান করে মাতাল হয়ে মাকে ডাকতে চাননি। চেয়েছেন ভাবের মাতাল হয়ে মায়ের কালো রূপে মন হারাতে।

অল্প বয়স থেকেই রামপ্রসাদ সংসার বিরাগী ছিলেন। তিনি মায়ের চরণ আশ্রয় করে ভবতরী পার হতে চান। চান না বিষয়-আশয়, আশ্রয় নিতে চান মায়ের চরণে। পদকার বলেন:

আসার আশা আশা কেবল আসা মাত্র হল।
চিত্রের কমলে যেমন ভৃঙ্গ ভুলে গেল।।
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তাই হল।
এখন সন্ধ্যা বেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।।[২৪]

মায়ের প্রতি দোষারোপ করে বলেছেন, সংসারের মায়ায় পতঙ্গের মতো ছলনা করে ভুলিয়ে রাখলে। অথচ প্রাপ্তি কিছুই হল না। তাই জীবনের শেষ বেলায় মায়ের শ্রীচরণেই আশ্রয় চান কবি। তিনি কালীর মধ্যেই সকল জগৎকে দেখতে পান। 'নিরাকার তারা' তার কাছে ব্রহ্মময়ী। তিনি যেখানেই তাকান, তাকে দেখতে পান- 'শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব ঘটে। ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা।।'

রামপ্রসাদ তার কালীতত্ত্বে সাংসারিক মোহ মুক্তির জন্য যোগীর মতো সাধনার কথা বলেছেন। মানুষের ষড় রিপু তাকে জাগতিক মায়া জালে বেঁধে রাখে। ষড় রিপুকে দমন করতে দেহের যোগ সাধনায় শক্তিকে উপলব্ধির কথা বলেছেন। আমরা বাংলা সাহিত্যের পাঠক মাত্রই জানি বাংলা সাহিত্যে তান্ত্রিক দেহ সাধনার সূত্রপাত চর্যাপদ থেকেই। পরবর্তী সময়ে হিন্দুতন্ত্র, বৈষ্ণব সহজিয়া, সুফি সাধক এবং উপধর্ম সম্প্রদায় সকলেই কমবেশি একই পদ্ধতিতে তন্ত্র বা দেহ সাধনার কথা বলেছেন। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার চক্রের মধ্যে দিয়ে কুণ্ডলিনী শক্তিকে ঊর্ধ্বগামী করাই ছিল এদের সাধনার মূল মন্ত্র। বিভিন্ন সাধনায় এদের নামভেদ আছে। কিন্তু পদ্ধতি কমবেশি এক। শাক্ত সাধনাতেও সাধকরা এই দেহ-যোগ সাধনার কথাই বলেন।

সাধকরা বলেন মানব শরীরে অজস্র নাড়ীর মধ্যে প্রধান হল ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। এদের মধ্যে দিয়েই প্রাণ বায়ু প্রবাহিত হয়। ইড়া-পিঙ্গলা থাকে শরীরের ডান-বাম পাশে। সুষুম্না মেরুদণ্ডের নিম্নসীমায় মূলাধার চক্র থেকে মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মূলাধার চক্রে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির অবস্থান। সাধকরা যোগ সাধনার দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বা শিবশক্তিকে ষটচক্রের মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বগামী করান। এই ষটচক্র তন্ত্র সাধনার মূল বিষয়। এখানে ষটচক্র হল মূলাধার চক্র, স্বাধিষ্ঠান চক্র, মণিপূরক বা মণিচক্র, অনাহত চক্র, বিশুদ্ধচক্র বা আকাশচক্র এবং সর্বোপরি আজ্ঞাচক্র। এগুলির অবস্থান ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। সবার উপরে আজ্ঞাচক্রে মহাশক্তির অবস্থান। যোগী সাধকরা ষড়রিপুকে দমন করে শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বা শিবশক্তিকে ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী করে আজ্ঞাচক্রে আনেন। তখন সাধক দিব্যদৃষ্টি বা জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করে।

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি যতক্ষণ মূলাধার চক্রে থাকে ততক্ষণ প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি নেই। রামপ্রসাদের একটি গানে এই সাধনার খোঁজ পাই:

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।।
রত্নাকর নয় শূন্য কখনো দু-চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দমসামর্থে এক ডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।।
জ্ঞানসমুদ্রের মাঝে রে মন শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে শিবযুক্তি মতোন চাইলে।।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে আহারলোভে সদাই চলে।

তুমি বিবেকহলদি গায় মেখে যাও ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।।[২৫]

এইভাবে যোগী কুলকুণ্ডলিনীকে ঊর্ধ্বগামী করে শক্তিকে লাভ করেন। এই যোগ সাধনায় সাধকদের কাছে মহাযোগী হলেন স্বয়ং শিব। শশীভূষণ বাবু বলেছেন, 'যোগিগণের মধ্যে পরম যোগী হইলেন স্বয়ং শিব-তিনি যোগীশ্বর। শক্তিতত্ত্ব তিনি যেমন করিয়া জানেন এমন আর কেহই জানে নাই-শক্তি তাই সর্বদা এই যোগীশ্বরের হৃদিস্থিতা, এই কারণেই কালী মহাদেবের হৃদয়ে।'[২৬] শিব তাই শব হয়ে কালীর চরণে আশ্রয় নিয়েছেন। রামপ্রসাদ তাই বলেছেন, 'মরে নাই শিব আছেন বেঁচে, যোগে আছেন মহাযোগী।' শিবের কালীর চরণ আশ্রয়ের যে ব্যাখ্যা তিনি করেছেন পরবর্তী সব শাক্ত সাধকরা সেই পথেরই অনুসরণ করেছেন।

সাধকরা সাধনার মধ্যে দিয়ে আদিশক্তির কালো রূপের মধ্যে আলোর সন্ধান করেছেন। আঠারো শতকের ভোগপূর্ণ সমাজে দাঁড়িয়ে রামপ্রসাদ সাংসারিক মোহমুক্তির কথা ঘোষণা করেছেন। একদিকে ধনের বৈভব, বিলাসিতার চাকচিক্য, অন্যদিকে দরিদ্র মানুষের জীবন যন্ত্রণা। এমন ধনের অসম বণ্টনের জন্য তিনি কালী মা'কেই দায়ী করলেন। নিজের মধ্যে দিয়ে আপামর দরিদ্র মানুষের হয়ে দেবীর কাছে অভিযোগ জানালেন। দেবতাকে সঙ্গে নিয়েই তিনি সাহিত্যে সমকালীন মানুষের জীবনকে তুলে ধরলেন। শোনালেন নতুন সুর।

তথ্যসূত্র:

১. সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, 'তন্ত্রের কথা', কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা:৩।
২. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য', কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা: ১০।
৩. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, 'শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা', কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা: ১৭
৪. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৯।
৫. তদেব, পৃষ্ঠা: ৭০।
৬. সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, তদেব, পৃষ্ঠা:৯।
৭. সর্বানন্দ চৌধুরী (সম্পাদিত), 'রামপ্রসাদী', কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমী (পূর্বাঞ্চলীয় অনুবাদ কেন্দ্র), ১৯৯৯, পৃষ্ঠা: ৪৩।
৮. Lokenath Ghosh, 'The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars & C', Part II, Calcutta: J. N. Ghosh & Co, Presidency Press, 1881, Page: 28.

৯. অমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত), 'শাক্ত পদাবলী', কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০, পৃষ্ঠা:৭৪।
১০.ভবতোষ দত্ত (সম্পাদিত), 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী', কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা:৬৪।
১১. 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩০২, কার্ত্তিক, ২য় ভাগ, ৩য় সংখ্যা।
১২. ভবতোষ দত্ত (সম্পাদিত), তদেব, পৃষ্ঠা:৪৯।
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা: ৫১।
১৪. সর্বানন্দ চৌধুরী (সম্পাদিত), তদেব, পৃষ্ঠা:৬২।
১৫. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, তদেব, পৃষ্ঠা:২২৮।
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা:২২৯।
১৭. রামকানাই দাস কর্তৃক প্রকাশিত, 'পদাবলী', কলিকাতা: সুধাসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮৪, পাতা সংখ্যা নেই।
১৮. ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'শাক্ত পদাবলী সাধন তত্ত্ব ও কাব্য-বিশ্লেষণ', কলিকাতা: এস ব্যানার্জি এন্ড কোং, ১৯৬০, পৃষ্ঠা:৫০।
১৯. অমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত), তদেব, পৃষ্ঠা:৯।
২০. তদেব, পৃষ্ঠা:৩২।
২১. তদেব, পৃষ্ঠা:৪৬।
২২. সর্বানন্দ চৌধুরী (সম্পাদিত), তদেব, পৃষ্ঠা:৩৯।
২৩. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, তদেব, পৃষ্ঠা:২৬২।
২৪. তদেব, পৃষ্ঠা:৫৭।
২৫. তদেব, পৃষ্ঠা:১০৯।
২৬. তদেব, পৃষ্ঠা:২৬৫।